আদি-মধ্যযুগের সূচনা ও বিতর্ক ঃ

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও আধুনিক ইতিহাসচর্চা-সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভারতে 'আদি-মধ্যযুগ' নামক কালপর্বের আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগের আদিপর্ব বলে কোনো কালবিভাজন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে সেই কালপর্ব নিরূপণের ভিত্তি কী হবে—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকেরা গভীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে প্রাচীন যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে উত্তরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। পণ্ডিতেরা প্রাচীনত্ব থেকে মধ্যযুগে কিংবা 'আদি-ঐতিহাসিক' থেকে 'আদি-মধ্যযুগে' রূপান্তরের ঘটনাটিকে প্রধানত প্রাচীন সাংস্কৃতিক মৌল (Civilizational matrix)-এর অবক্ষয়ের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। এই অবক্ষয় যে সামাজিক সংকট সৃষ্টি করে, তার প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন কারণের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক ***নীহাররঞ্জন রায়*** হূন উপজাতির আক্রমণের উল্লেখ করেছেন। ***আর. এস শর্মা*** বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সপ্তম শতকের ভূমিদান ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের ঘটনাকে। আবার ***ড. আর. এন. নন্দী*** তাঁর '*Urban Decay in India*' (C. 300–C. 1000) শীর্ষক গ্রন্থে নগরের অবক্ষয়জনিত সমস্যাকে সামাজিক সংকটের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। *আর. এস. শর্মা* সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় পুরাণশাস্ত্রে ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত *'কলিযুগ'*-এর ধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সংকট তথা মধ্যযুগের আবির্ভাবের প্রসঙ্গটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লিখিত কারণসমূহের ঐতিহাসিক সত্যতা, কালানুক্রম এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটা ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক পর্ব হিসেবে 'আদি-মধ্যযুগ'-এর ধারণা ও প্রয়োগ ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (১৯৫০ খ্রিঃ) বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জয়পুর ইতিহাস-কংগ্রেসেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তবে তখন এই বিভাজনের ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। তৎকালীন ভারতের প্রাচীন যুগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্বের পরিধি ৭১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ৭১২ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের পরিধি। এক্ষেত্রে সিন্ধুতে আরব মুসলমানদের আক্রমণকে 'প্রাচীন ভারতেরই একটি পৃথক অধ্যায়ের সূচনা পর্ব' বলে বিবেচনা করা হয় এবং প্রচলিত ধারণা অনুযায়ীই দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠার মুহূর্তকে প্রাচীন যুগের সমাপ্তি বলেই চিহ্নিত করা হয়। নতুনত্ব এই যে, ভারতে দীর্ঘ মুসলমান শাসনকালকে দুটি পর্বে ভাগ করার চেষ্টা এখানে করা হয়। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ দিল্লিতে সুলতানি শাসনের সূচনা থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ দিল্লিতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠার কালকে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত করা হয়।[1] বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, আর. এস. ত্রিপাঠী* প্রমুখের লেখা প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ***ড. রামশরণ শর্মা*** এই ঘটনাকে তথাকথিত ব্রিটিশ পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীন ভারতকে 'হিন্দু ভারত' এবং মধ্যযুগের ভারতকে 'মুসলমান ভারত' নামে অভিহিত করার প্রয়াসের ফল বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেন, *"আগের প্রজন্মের হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহাসিকদের বদ্ধ সংস্কার হচ্ছে তাঁরা মধ্যযুগের সাথে মুসলমান শাসনকে একীকরণ করেন।"*[2] সমস্যা হল যে, মুসলমান শাসনকে মধ্যযুগের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে বলতে হয় যে, নেপালে কদাপি মধ্যযুগের আবির্ভাব ঘটেনি, কিংবা তুরস্ক, মিশর, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ স্থায়ীভাবেই মধ্যযুগেই আটকে আছে। কিন্তু এমন ধারণা ইতিহাসগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

1. *Proceedings of the Indian History Congress, 13th Session, Nagpur 1950.*
2. *আর. এস. শর্মা—আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, ২০০৩, পৃ. ২।*

Scanned by CamScanner

ড. নীহাররঞ্জন রায় ষাটের দশকের শেষদিকে নিছক কালানুক্রমভিত্তিক ইতিহাসের যুগ-বিভাজনের পরিবর্তন দাবি করেন। তাঁর মতে, কালভিত্তিক যুগবিভাজন অবশ্যই সেই যুগের বিশেষত্ব দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত। অতঃপর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও দুটি পৃথক কালানুক্রমের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব অর্পিত হয়। আদি-মধ্যযুগ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আদি-মধ্যযুগ বলতে কী বোঝা হয় এবং কীসের ভিত্তিতে আদি-মধ্যযুগের নামাঙ্কন করা হয়েছে, তা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যিক। 'আদি-মধ্যযুগ' নামক একটি প্রাক্-পর্যায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করার মাধ্যমে ইতিহাসের ধারায় নিরবচ্ছিন্নতার পাশাপাশি একটি পরিবর্তনশীলতার কথাও মান্য করা হয়। *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের* মতে, প্রাচ্যবাদী (Orientalist) লেখকদের উন্নাসিকতা এবং ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনহীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত প্রত্যয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করার কাজে 'আদি-মধ্যযুগের' ধারণার উদ্ভব গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারার প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনে ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই *ড. চট্টোপাধ্যায়* মনে করেন, এই বিতর্কের সমাধানের জন্য কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। যেমন—(ক) প্রাচীন যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে উত্তরণের পরিবর্তনসমূহের প্রকৃতি নিরূপণ, এক্ষেত্রে প্রাচীন যুগ বলতে সঠিক কী বুঝি—সে বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং পরবর্তীকালীন পরিবর্তনসমূহের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সাহায্য করতে পারে। (খ) ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত কালপর্বে কী ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ইত্যাদি।

'প্রাচীন যুগ', 'আদি-মধ্যযুগ' প্রভৃতি নামের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষণীয় ; এবং এই সকল ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত না-হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের কালবিভাজন যে ইতিহাসচর্চার অঙ্গ হওয়া উচিত, তা প্রাচীন যুগ সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার আপাত পরিণতি থেকে বোঝা যায়। একসময় মনে করা হত যে, আর্যদের আগমনকাল থেকেই ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছে, যা সার্বিকভাবে প্রাচীন যুগের প্রাক্‌মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে সেই ধারায় ছেদ পড়ে এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যায় অর্থাৎ মধ্যযুগের সূচনা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, তথাকথিত প্রাচীন যুগের আগেও ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক স্তরের অস্তিত্ব ছিল। প্রাক্-আর্য পর্বের এই সময়কে *ধর্মানন্দ দামোদর কোশাম্বী* বলেছেন, 'লিভিং প্রি-হিস্ট্রি' (Living Pre-history)। অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশের প্রস্তর যুগ, হরপ্পা সংস্কৃতির যুগ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাক্‌লৌহ যুগ, এমনকি লৌহ যুগকেও সামগ্রিকভাবে 'প্রাচীন যুগ'-এর শ্রেণিতে সন্নিবিষ্ট করা যায় না। 'প্রাক্-ইতিহাস' নামাঙ্কন দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর পরে এসেছে 'প্রায়-ইতিহাস' বা Proto-History পর্যায়টি এবং এরই পরিণত রূপটি হল অতি পরিচিত 'প্রাচীন যুগ'। একইভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী স্তরে একটি স্বতন্ত্র স্তরের অর্থাৎ 'পরবর্তী-প্রাচীন' (Post-ancient) বা আদি-মধ্য (Early mediaeval) অস্তিত্ব কল্পনা করা অনৈতিহাসিক হবে না।

আধুনিক ইতিহাসচর্চার ব্যাকরণ মেনে অধ্যাপক *চট্টোপাধ্যায়* 'আদি-ইতিহাস যুগ' বা তথাকথিত প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে সেগুলির পরিবর্তনের ভিত্তিতে মধ্যযুগের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। (ক) 'রাজন্য'-শাসিত আঞ্চলিক রাজ্য ব্যবস্থার অবসান এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়া হত নগদ অর্থে এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাতদের অস্তিত্ব ছিল না। (খ) সরল মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন এযুগে দূরপাল্লার

Scanned by CamScanner

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং নগরায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করে। হস্তশিল্পের গ্রামীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রাম-সমিতির কর্তৃত্ব এবং জমির ওপর গোষ্ঠীমালিকানার অস্তিত্বও প্রাক্-মধ্যযুগকে বিশিষ্টতা দেয়। (গ) সামাজিক জীবন ছিল কঠোরভাবে বর্ণভিত্তিক। রাজন্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণি ছিল সুবিধাভোগী ও কর্তৃত্বের অধিকারী। বৈশ্যরা ছিল প্রধান কর প্রদানকারী এবং দৈহিক শ্রমের দায়বদ্ধতা ছিল শূদ্রশ্রেণির ওপর ন্যস্ত। দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। (*"The existence of 'Slavery' in various forms was also an attribute of the period....that labour represented a Pre-'Serfdom' phase."*)[1] ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির এই সকল বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। এই সকল প্রাক্-মধ্যযুগীয় বা আদি-ঐতিহাসিক (early historical) বৈশিষ্ট্যের রূপান্তরের ভিত্তিতে 'আদি-মধ্যযুগ'-এর আবির্ভাবের বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব।

অধ্যাপক ***নীহাররঞ্জন রায়*** 'মধ্যযুগ' তত্ত্বের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।[2] তাঁর মতে, সপ্তম শতকে মধ্যযুগের প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং পরবর্তী এক শতকে তা স্পষ্ট রূপ নেয়। অধ্যাপক রায় মধ্যযুগকে তিনটি উপপর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বের পরিধি সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর এবং তৃতীয় পর্বের পরিধি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। মধ্যযুগের উপবিভাগীকরণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক রায় কোনো বিশেষ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। তিনি সামগ্রিকভাবেই ভারতে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থাপনা করেছেন। যেমন—(১) এই পর্বে আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থানের সাথে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাযুজ্য লক্ষণীয়। (২) মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে স্বাভাবিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। (৩) সামাজিক ভাববিনিময়ের উপাদানসমূহ, যেমন—লিপি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনার সাথে এই ব্যবস্থার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। (৪) ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় এবং জাতি ও উপজাতিভিত্তিক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। (৫) শিল্পকলা বা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রাবল্য দেখা যায়। (৬) ভারতীয় শিল্পকলার পরিবর্তে পূর্ব ভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয়, মধ্য ভারতীয়, দক্ষিণী শিল্পধারা ইত্যাদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আবার চোল শিল্প, পল্লব শিল্প ইত্যাদি আঞ্চলিক ধারার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ***চট্টোপাধ্যায়*** মনে করেন, ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, ভারতে তুর্কি-শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েক শতক আগে থেকেই মধ্যযুগীয় উপাদানের অস্তিত্ব ছিল এবং আদি-মধ্যযুগীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ***ড. রামশরণ শর্মা*** তাঁর *'ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম'* শীর্ষক গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল-সংক্রান্ত বিতর্কটিও তাঁর *'আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি'* গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক শর্মার মতে, কেবল রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার অবক্ষয় কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের প্রসারের বিচারে সপ্তম শতককে ভারতে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ মৌর্য বা গুপ্ত রাজারা ভারতের বৃহত্তর স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি। তেমনি এদের পতনের পরে রাজনৈতিক বিভাজন ভারতে

1. *B. D. Chatterjee—The Making of Early Mediaeval India, 1998, P. 7.*
2. *N. R. Roy—The Mediaeval Factor in Indian History, Vide B. D. Chatterjee, Ibid, P. 8-9.*

Scanned by CamScanner

ইতিহাসের কোনো স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু প্রাক্-গুপ্তযুগীয় ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সাথে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন বা দক্ষিণ ভারতে পল্লব ও চালুক্যদের পার্থক্য দেখা যায়। প্রাক্-গুপ্তযুগে প্রশাসনের ভিত্তি ছিল বিভিন্ন স্তরের আমলা। এদের বেতন দেওয়া হত নগদ অর্থে। কিন্তু গুপ্তযুগে এবং নির্দিষ্টভাবে গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তম শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিদান গুরুত্ব পায়। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্ব ভূমিস্বত্বভোগীদের হাতেই ন্যস্ত হয়। স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায়। *ড. শর্মা* লিখেছেন, *"অনেকগুলি রাজধানীর অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতাই নির্দেশ করে। প্রাচীন পুঁথিতে দুর্গসমন্বিত রাজধানী বা দুর্গকে রাষ্ট্রের একটি বিশেষ অঙ্গ মনে করা হত। কিন্তু আদি-মধ্যযুগে একজন রাজার কয়েকটি রাজধানী থাকত। স্পষ্টতই নগর-দুর্গগুলি রাজা, প্রজা ও বৃহৎ ভূস্বামীদের সুরক্ষার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও কৃষকদের বিরুদ্ধে নির্মিত হয়েছিল এবং এটাই ছিল আদি-মধ্যযুগের চিত্রের একটি অংশ।"*[1]

অধ্যাপক *শর্মার* মতে, শেষ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ থেকে মধ্যযুগীয় সমাজে রূপান্তরের প্রধান কারণ ছিল নতুন ভূমিদান ব্যবস্থা। গুপ্তযুগের শেষদিকে 'অগ্রহার' ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রথমে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ধর্মস্থানকে নিষ্কর ভূমিদান শুরু হয়। ৩০০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ভূমিদান ব্যবস্থা সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন প্রবণতার জন্ম দেয়। খ্রিস্টীয় ৬৫০-১২০০ সময়কালে এই ব্যবস্থা পরিণত রূপ পায়। অগ্রহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রদত্ত ভূখণ্ডের ওপর (আবাদি বা অনাবাদি জমি বা গ্রাম) দানগ্রহীতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দানগ্রহীতা ক্রমে ভূস্বামীতে পরিণত হন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অব্রাহ্মণ বা শাসক শ্রেণির লোকেরাও বেতনের পরিবর্তে ভূখণ্ড ভোগদখলের অধিকারী হন। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার অধিকারী হন। ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার এবং ভূস্বামীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শিথিল ও খণ্ডিত হয়। রাজা তাঁর অধীনস্থ সামরিক কর্মচারী বা শাসক কর্মচারীদের বৃহৎ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা জোরালো হয়। এই ব্যবস্থার সাথে মধ্যযুগের জায়গির ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়।[2] এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সমর্থনে অধ্যাপক শর্মা পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত ***কলিযুগ*** তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। আনুমানিক পঞ্চম শতকে পুরাণ কাহিনী সংকলিত হয়। এখানে বর্ণিত চারটি যুগের শেষতম পর্বটি 'কলিযুগ' নামে বর্ণিত ও নিন্দিত। এই যুগের বৈশিষ্ট্যই হল অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও আর্থসামাজিক সংকট। এই বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সপ্তম শতকে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, কৃষকদের দুঃখদুর্দশা, বাণিজ্যের অবনতি ইত্যাদির ইঙ্গিত এই বর্ণনা থেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অবাস্তব নয়। গুপ্তদের পতনের পর ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে আঞ্চলিকতার বিকাশ এই যুগপরিবর্তনের আভাস দেয়। সমকালের বৃহৎ শক্তিগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত হয়। যেমন—বাংলায় পাল ও সেন বংশ ; উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গুর্জর ও প্রতিহার বংশ ; দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট ও চোল বংশ ইত্যাদি। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য যুগপরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। অনুরূপভাবে সামন্তব্যবস্থার বিকাশ সামাজিক ধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভোগ ও আঞ্চলিক প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। উদ্‌বৃত্ত পণ্যের অভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন ঘটায়। পণ্য বিনিময়ের সুযোগ কমে যাওয়ায় এক বদ্ধ অর্থনীতির জন্ম হয়। সপ্তম শতকে ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির সমরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এই পর্যায়কে 'আদি-মধ্যযুগ' নামাঙ্কিত করা সম্ভব।

---

1. *রামশরণ শর্মা—আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, ২০০৩, পৃ. ৭।*
2. *রণবীর চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, বাংলা ১৪০৪, পৃ. ১৮৯।*

Scanned by CamScanner

আদি-মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে অধ্যাপক শর্মা ও যাদব (B. N. S. Jadav) ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন ও নগরের অবক্ষয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। এঁদের মতে, ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের দূর বাণিজ্যে মন্দা আসে। এই সময়ে রোম, ইরান ও বাইজানটিয়ানের সাথে সমৃদ্ধ রেশম বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। একাদশ শতকের মধ্যেই ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে আরব বণিকদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দ সময়কালে সোনা ও অন্যান্য ধাতুমুদ্রার স্বল্পতা বাণিজ্যের মন্দার প্রমাণ দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা নগরের অবক্ষয় নিয়ে আসে।[1] শর্মা তাঁর *'পারস্পেকটিভস ইন সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক হিস্ট্রি অফ আর্লি ইন্ডিয়া'* শীর্ষক গ্রন্থেও গুপ্তোত্তর যুগে বাণিজ্যিক নগরের অবক্ষয় ও পতনকে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকারী বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধ্যাপক ***ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*** সপ্তম শতকে নগরের অবক্ষয়ের কথা মেনে নিলেও, এই ব্যবস্থা যে সার্বিক ছিল না, তা পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

অধ্যাপক *চট্টোপাধ্যায়* ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতে আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ও বিকাশকে আদি-মধ্যযুগের সূচনা তথা বিশিষ্টতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজস্থান অঞ্চলকে গবেষণার ভিত্তি করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সপ্তম শতকের পর থেকে রাজস্থানে *'রাজপুত'* নামে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন 'হূন'দের মতো বিদেশি উপাদান ছিল ; তেমনি ছিল ভারতীয় চৌলুক্য ও গুহিলট বা গুহিলো'দের মতো দেশজ উপাদান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই বংশজাত একাধিক গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর ও শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। গুজরাট ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুহিলো'দের একাধিক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ছোটো ছোটো রাজ্য ছড়িয়ে ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে গুহিলো'দের 'নাগদা-আহর' গোষ্ঠী মেবারকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক *বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়* দেখিয়েছেন যে, সপ্তম-অষ্টম শতকে রাজস্থানের নানা অঞ্চলে ভূমি-বন্দোবস্তের ভিত্তিতে শক্তি সঞ্চয়কারী এবং মূলত কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে গুর্জরদের নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম ভারতে আদি-মধ্যযুগে উদ্ভূত একাধিক রাজবংশের মধ্যে গুর্জর-রক্তের অস্তিত্ব দেখা যায়।[2] পূর্বাঞ্চল উড়িষ্যা বা দাক্ষিণাত্যে চোল, পল্লব, পাণ্ড্য রাজ্যের উত্থানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষিভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

অধ্যাপক *চট্টোপাধ্যায়ের* মতে, আদি-মধ্যযুগের গঠনপর্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। অঞ্চল ভিত্তিতে এই রূপান্তরের চরিত্রগত বা গঠনগত বৈচিত্র্য থাকতেই পারে। তবে পরিবর্তনশীলতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সহমত পোষণ করেন। কারণ, এই গুণাবলিসমূহ আদি-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত। ***প্রথমত,*** আদি-ইতিহাস যুগে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতার দোদুল্যমানতা। কিন্তু গুপ্ত-উত্তর যুগে কেন্দ্রমুখী ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভূত ও ক্রমোচ্চ স্তরবিশিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে ; যেখানে অসংখ্য প্রায় স্বাধীন সামন্ত, উপসামন্ত ও অনুরূপ কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল। ***দ্বিতীয়ত,*** গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান-সমৃদ্ধ একটি ভূমিভিত্তিক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এর দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রমুখীনতা এবং ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। প্রাক্-গুপ্তযুগে এরূপ ভূম্যধিকারী সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। এই সামাজিক শ্রেণির উত্থান রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিচ্ছিন্নতা ও বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত

1. *M.K. Dhavalikar—Historical Archaeology of India, 1999, Chap. IV.*
2. *B. D. Chatterjee—Ibid, P. 10-11.*

Scanned by CamScanner

করে। *তৃতীয়ত,* আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগে রূপান্তরের ধারায় প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর কেন্দ্রগুলির এবং বাণিজ্যিক যোগসূত্রের পতন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরিণামে বাজার অর্থনীতি (Market economy) বা মুদ্রা অর্থনীতির (Currency economy) পরিবর্তে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটে। নগদ অর্থের সংকটের ফলে কর্মচারীদের বেতন নগদ অর্থের পরিবর্তে ভূমিবন্দোবস্তের মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়। এই সূত্রে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী গ্রামমুখী হয় এবং কৃষি-সম্প্রসারণ ঘটে। গ্রাম-সমাজে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার শর্তে ***যজমানী ব্যবস্থা*** গড়ে ওঠে। এটি ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির অংশ। শস্য সংগ্রহের সূত্রে প্রাপ্ত ধানের ভাগ ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ, শাসক ও বিভিন্ন ধরনের শ্রমিককে দেওয়া হত। বৃহৎ ভূমি-সম্পদের অধিকারী ব্রাহ্মণরা কৃষকদের চেতনায় নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এই আদর্শগত *(ভৃত্যবর্গ পোষণম্)* পরিবেশ গড়ে তুলতেন। ***চতুর্থত,*** আদি-ঐতিহাসিক কৃষি-সংগঠনে স্বাধীন কৃষক হিসেবে বৈশ্য সম্প্রদায় এবং শ্রমজীবী শূদ্রশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গুপ্ত-পরবর্তী পর্যায়ে প্রায়-ভূমিদাস চরিত্রবিশিষ্ট এমন এক কৃষকশ্রেণির উদ্ভব ঘটে যারা বহুলাংশে জমির সাথে আবদ্ধ, যাদের কাছ থেকে প্রভু জোরপূর্বক শ্রম আদায় করে এবং শাসক আদায় করে অযৌক্তিক ধরনের উচ্চ-রাজস্ব। ***ড. চট্টোপাধ্যায়*** লিখেছেন, *"The condition of the peasantry in this pattern of rural stratification was in sharp contrast to what the agrarian structure in early historical India represented."*[1] ***পঞ্চমত,*** গুপ্ত-পরবর্তী যুগ জাতি-বিস্তার ও বিচ্ছিন্নতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই সময় প্রচলিত বর্ণ থেকে অনেকগুলি জাতির জন্ম হয়। বহু নতুন উপজাতি ও জাতি তাদের সাথে যুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে রাজপুত নামে নতুন জাতির উত্থান জাতি-বিস্তার দ্রুত করে। এদের কেউ কেউ ক্ষত্রিয় থেকে এসেছে। চালুক্য, চান্দেল ও পালরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ কুলজি শাস্ত্রকারদের দ্বারা সম্মানীয় ক্ষত্রিয় কুল পেয়েছিলেন। আদি-মধ্যযুগ এদের শাসনকর্ম দ্বারা চিহ্নিত। ব্যাকট্রিয়, গ্রিক, শক ও প্রার্থীয়গণ হিন্দু সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষত্রিয় হিসেবে গৃহীত হয়। ষষ্ঠ শতকে হূন ও গুর্জররা রাজপুত হিসেবে গণ্য হলে ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সপ্তম শতকে গুরুমুখী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সমূহ এবং শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে দ্রুত বেড়ে-ওঠা সম্প্রদায়গুলি ক্রমে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিত হয়।[2] প্রাক্-গুপ্তযুগে 'বর্ণসংকর' ব্যবস্থার অস্তিত্ব জাতিবিকাশের সম্ভাবনা দেখালেও, কার্যত গুপ্ত-পরবর্তী যুগেই জাতিব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখা যায়, ফলে আদি-মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ***ষষ্ঠত,*** সপ্তম শতকে ধর্মদর্শন ও সংস্কৃতির সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র আদি-মধ্যযুগের আবির্ভাবের সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ধর্মদর্শনের মর্মকথা ছিল *'ভক্তি'*। ভক্তিবাদের শিক্ষায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভক্তিবাদে ভক্ত ও ঈশ্বর বা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি হল *'আনুগত্য'* ও *'আত্মত্যাগ'*। সামন্তব্যবস্থার ভিত্তিও হল প্রভু ও প্রজার পারস্পরিক আনুগত্য ও নির্ভরতা ('The core of ideology of the period is seen to be characterised by 'Bhakti', which was feudal in content, since it accentuated the relationship of loyalty and devotion, which are believed to be hallmarks of feudal ties.')।[3] গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ব্রত ও উৎসবের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত-পূর্ব গ্রন্থগুলিতে ব্রত'র সংখ্যা ছিল সীমিত। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে এর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত বর্ণের মানুষ ব্রত পালনের অধিকারী হওয়ায় এটি সর্বজনীন চরিত্র পায়। এর পাশাপাশি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে

1. *B. D. Chatterjee—Ibid, P. 11.*
2. *R. S. Sharma—Ibid.*
3. *D. N. Jha (ed)—Feudal S...*

Scanned by CamScanner

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে 'তন্ত্রবাদ' বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তন্ত্রবাদ দ্বারা শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি হিন্দু ও তথাকথিত প্রতিবাদী ধর্মমত প্রভাবিত হয়। কলা, সাহিত্য, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান প্রভৃতির ওপরেও তন্ত্রের প্রভাব পড়ে। তন্ত্রবাদের ফলে সামাজিক সমন্বয় দৃঢ়তর হয় এবং এই মতাদর্শ উপজাতীয় মানুষকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার কাজে সহায়তা করে।[১]

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানসমূহ ঃ

সাহিত্য ঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাসচিন্তা ও ইতিহাস লেখার সূত্রপাত ভারতে ঘটে ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাসচর্চার নতুন ধারার সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারতে ইতিহাসবিদ্যা ও ইতিহাসচর্চার আবির্ভাব ঘটে। তবে আধুনিক যুগে ভারতে ইতিহাসবিদ্যার আবির্ভাব ঘটলেও প্রাচীনকালে এদেশে ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চা একেবারেই ছিল না কিংবা সেকালে ইতিহাস গ্রন্থ আদৌ রচিত হয়নি— এমন ধারণা সঠিক নয়। *'Hero-lands'* গীতগাথায় ভ্রূণাকারে ইতিহাসমূলক বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক/ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িক, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস *'পঞ্চম বেদ'* হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের ওপর একটা পবিত্রতার ছাপ দেওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, কৌটিল্য কথিত ইতিহাস ধর্মের এক্তিয়ার-বহির্ভূত মানবজীবনের নানা দিককে স্পর্শ করতে দায়বদ্ধ ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনা-বিষয়ক ঐতিহ্য, আর্থরাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ... এবং ... তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ, আইন-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিধিবিধান

Scanned by CamScanner